সাংবাদিকের তথ্য অভিগম্যতা: তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

ডঃ শামসুল বারি

ভূমিকা :

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয়টি আমি খুবই সময়োপযোগী বলে মনে করি। আর এই সভায় **"সাংবাদিকের তথ্য অভিগম্যতা ও তথ্য অধিকার আইন"** সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে বলার জন্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আয়োজকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিষয়টি কেন সময়োপযোগী?

সময়োপযোগী মনে হবার কারণ এই যে, আমি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-কে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলোর মধ্যে অন্যতম মনে করি। আমি বিশ্বাস করি যে, আইনটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে এটি দেশের জন্যে প্রচুর সুফল বয়ে আনবে। এটিই দেশের একমাত্র আইন যা জনগণকে দেশের সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা ব্যবহার ক'রে জনগণ সরকারের কাজে নজরদারি করতে পারে এবং এভাবে সরকারের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন ক'রে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অন্য কোনো আইনের মাধ্যমে সরাসরি তা করা যায় না।

আমি আরো মনে করি যে, জনগণ চাইলে আইনটিকে দুর্নীতি দমন আইনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও কার্যকররূপে গড়ে তুলতে পারে। কারণ এটি ব্যবহার করতে সরকারের দ্বারস্থ হ'তে হয় না। জনগণ নিজেরাই দুর্নীতি চিহ্নিত ক'রে একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তা উদ্ঘাটন ক'রে প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারেন। আজ বিশ্ব গণমাধ্যম দিবসে বিষয়টির তাৎপর্য আরো বেশি, কারণ আমি মনে করি যে, গণমাধ্যমই আইনটিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সবচেয়ে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

গত সাত বছরে আইনটির কেমন অগ্রগতি হয়েছে?

তবে জনগণের জন্যে এত উপকারী ও উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও আইনটির ব্যাপারে দেশের সিংহভাগ মানুষের অসচেতনতা, অনীহা ও অনুৎসাহ আমাকে ও আমার মতো অনেককে আশ্চর্য ও ব্যথিত করে। আমাদের জনগণ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাপারে সব সময়ই সোচ্চার বলে আমরা জানি। এসব ব্যাপারে তাদেও তৎপরতা দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের মতো অতি শক্তিশালী একটি আইনের বাস্তবায়নের জন্য আমরা তাদের মধ্যে তেমন তৎপরতা লক্ষ করি না কেন? আইনটি কার্যকর হয়েছে প্রায় সাত বছর হ'তে চললো। এটি কেমন চলছে, ঠিকমতো চলছে কিনা, এর প্রতিকূলতা/প্রতিবন্ধকতাগুলো কী, তা কীভাবে নিরসন করা যায়, এসব নিয়ে আমরা ক'জন ভাবছি? কেন এ ব্যাপারে বহুল লেখালেখি, আলাপ-আলোচনা হ'তে দেখি না বা শুনি না?

আমার আরো বেশি অবাক লাগে এই ভেবে যে, আমাদের দেশের অতি সক্রিয় গণমাধ্যম ও তার সঙ্গে জড়িত সাংবদিকগণও তথ্য অধিকার আইনটির ব্যাপারে আশানারূপভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তাঁদের কাজের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা তাঁরা তেমনভাবে উপলব্ধি করেন বলে মনে হয় না। কারণ আইনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁদের উৎসাহ ও তৎপরতা তেমন নজরে পড়ে না।

তবে একথাও ঠিক যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হবার আগের প্রায় এক দশক ধ'রে এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। আইনটির প্রণয়নের ব্যাপারেও তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এটি গৃহীত হবার পরে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আমি মনে করি যে, দেশের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আইনটির প্রয়োগ ও প্রসারের ব্যাপারে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকসহ দেশের প্রায় সকলের এই ঔদাসীন্য দুঃখজনক। আমার

আজকের এই বক্তৃতায় তাই আমি এই বিষয়টির ওপরই আলোকপাত করবো। গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের কাছে আমার অনুরোধ যে, এ ব্যাপারে আমরা জ্ঞান ও ধারণায় ভুল থাকলে তাঁরা যেন আমাকে শুধরে দেন। তবে আমি চাইবো যে, তাঁরা আমার কথাগুলো নিয়ে বিশেষ ক'রে ভাববেন।

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের সব কাজে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত ক'ওে তাদেরকে সরকারের আরো কাছে নিয়ে আসা এবং সরকারি কাজে জনগণের মালিকানা সৃষ্টি করা। আইনটির মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিককে সরকারি কাজে নজরদারি করার একটি আইনি অধিকার দেয়া হয়েছে। সরকার কীভাবে কাজ করে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দেশের আইন মেনে কাজ করে কিনা, ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় কিনা, এসবই দেশের সমস্ত নাগরিক আইনটি ব্যবহার ক'রে সরকারের কাছে সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে চেয়ে যাচাই করে নিতে পারে। আর এভাবে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এনে জনগণের কাছে সরকার ও তার সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধ ও জবাবাদিহি করতে পারে।

তাই আইনটিতে সরকারি কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকেই তথ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কীভাবে কাজ করে, কী কী জিনিসের ওপর ভিত্তি ক'রে কাজ করে, কাজে যেসব ফাইল ব্যবহার করে বা তৈরি করে, তারা যেসব সিদ্ধান্ত নেয় এসবই তথ্য। অর্থাৎ সরকারি অফিসে যে যে তথ্য গচ্ছিত আছে তা সবই এই আইনের আওতায় পড়ে। এইসব তথ্য সাধারণত অফিসের ফাইলে লিপিবদ্ধ থাকে, দলিল হিসেবে থাকে, সিডি হিসেবে থাকে, নমুনা হিসেবে থাকে, রিপোর্ট হিসেবে থাকে অথবা অন্য অনেক রূপে থাকে।

সরকারি তথ্য জনগণকে কীভাবে সাহায্য করে?

সরকারের কাছে এই তথ্য জানতে চাওয়ার মাধ্যমে দেশের যেকোনো নাগরিক যেমন নিজের নানা সমস্যা বা চাহিদার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান জানতে চাইতে পারে, তেমনি বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা সমস্যা-দুর্ভোগের ব্যাপারে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং কোন্ সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনার ভিত্তিতে তা নিচ্ছে,তা জানতে চেয়ে প্রতিকারের পথ খুঁজতে পারে। শুধু সরকার (অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ)-ই নয়, জনগণের অর্থে পরিচালিত (যেমন, সরকারি ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহ) কিংবা সরকারি অর্থ ও সুবিধাভোগী যেকোনো প্রতিষ্ঠান (যেমন, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়)-এর কাজের সম্বন্ধে জানতে চেয়ে,ঈপ্সিত প্রতিকার কামনা করতে পারে। আরো অনেক বিষয়ে, যেমন, সরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলো জনগণকে ঠিকমতো সেবা দিচ্ছে কিনা, জনগণের অর্থ সেখানে ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে কিনা; যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হয় তাদেও কাজে কোনো অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আছে কিনা; রাস্তা-ঘাট-ব্রীজ তৈরি-মেরামত সংক্রান্ত বিষয়সহ এমপিদের বরাদ্দসমূহ কীভাবে খরচ হয়, কোন্ ঠিকাদার কীভাবে নিযুক্ত হয়েছে ইত্যাদি নানা ধরনের তথ্য সরকারের কাছ থেকে জানতে চেয়ে আইনটির লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে।

জনগণের তথ্য অধিকারের আইনি ভিত্তি কী?

এখানে বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ গৃহীত হয় আমাদের দেশের সংবিধানের ৩৯ ধারায়-স্বীকৃত নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকারকে সরাসরি প্রয়োগযোগ্য আইনে পরিণত করতে। অন্যান্য যেসব দেশে আইনটি ফ্রিডম অফ্ ইনফরমেশন, একসেস্ টু ইনফরমেশন ইত্যাদি নামে পরিচিত, তার অনেকগুলো দেশে আাইনটিকে প্রয়োগযোগ্য অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। অর্থাৎ সেখানে জনগণের পক্ষে সরকারি তথ্য জানার প্রয়োজন স্বীকৃত হলেও আইনি প্রক্রিয়ায় তা সরাসরি কার্যকর করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আমাদের আইনে আমরা এটি ব্যবহার ক'রে সকল সরকারি ও কিছু বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রার্থিত তথ্য চাওয়া ছাড়াও, তথ্য না পেলে তার জন্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ ক'রে, তথ্য আদায়ের ব্যবস্থাসহ সময় মতো তথ্য সরবরাহ না করার জন্য কর্তৃপক্ষের শাস্তিও দাবি করতে পারি।

আমাদের দেশে আইনটি কেন গতি লাভ করছে না?

এত শক্তিশালী এই আইনটি কী গত সাত বছরে বাংলাদেশের জনগণকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে? আমার মনে হয় পারেনি। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে, সারা দেশে আইনটির ব্যবহার এখনো তেমনভাবে সৃষ্টি হয়নি। এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা গত সাত বছরে যে অতিধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তা বোঝা যায় তথ্য কমিশনের বার্ষিক পরিসংখ্যান থেকে। যেখানে প্রতিবেশী দেশ ভারতে বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ তথ্য আবেদন জমা পড়ে কেন্দ্রের ও প্রদেশগুলোর সরকারি অফিসসমূহে, সেখানে আমাদের দেশে এই সংখ্যা বছরে গড়ে ২০ হাজারও হয় না। ষোল কোটি লোকের দেশে কেন আরো বেশি ক'রে তথ্য আবেদন সৃষ্টি হচ্ছে না? নতুন আইন ব'লে উদার দৃষ্টিতে ঘাটতি ব্যাখ্যা করলে চলবে না। সাত বছরে আরো অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল।

আমাদের মেনে নিতে হবে যে, বিভিন্ন কারণে জনগণ আইনটি সম্বন্ধে অবগত হচ্ছে না, বা আইনটিকে ব্যবহার করছে না বা করতে চাইছে না। এর কারণ উদ্ঘাটন ক'রে আইনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাই গভীরভাবে ভাবতে হবে। কেন আরো বেশি ক'রে জনগণ আইনটি সম্পর্কে জানছে না, বা জানলেও ব্যবহার করছে না? আর শত বছরের সরকারি গোপনীয়তার-সংস্কৃতি ভেদ ক'রে সরকারি কাজকে জনগণের কাছে উন্মুক্ত ক'রে দেয়া আদৌ সম্ভব কিনা, সরকারও এ ব্যাপারে আদৌ আন্তরিক কিনা, আইনটি কার্যকর করতে কীভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের মানসিকতা পরিবর্তন করা যায়, এটি ব্যবহার করলে কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়তে হয় কিনা, বা তা রোধ করতে কী করা যায়, ইত্যাদি নানা বিষয় সবাইকে খতিয়ে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের বা তথ্য কমিশনের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি নাগরিক সমাজের দায়িত্বও অপরিসীম। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি অন্যান্য দেশের মতো আমাদের সংবাদমাধ্যমই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের তাত্ত্বিক ভিত্তি কী?

তথ্য অধিকার আইনটিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্যে এর ধারণা সংক্রান্ত একটি বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার ক'রে নেয়া দরকার। সবাইকে মনে রাখতে হবে, তথ্য অধিকার আইনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে যে, দেশের সকল নাগরিক দেশের সব ক্ষমতার মালিক বা প্রিন্সিপাল এবং সকল সরকারি কর্তৃপক্ষ ও তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হচ্ছে জনগণের এজেন্ট বা কর্মচারী। এই প্রিন্সিপাল-এজেন্টের তাত্ত্বিক সম্পর্ক ব্যবহার হয় প্রধানত অর্থনৈতিক বা বাজারনীতির ক্ষেত্রে। সেখানে ব্যবসার মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রিন্সিপাল-এজেন্টের সম্পর্ক সুবিদিত। তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে এই প্রিন্সিপাল-এজেন্ট ধারণা সুস্পষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ভোটাররা যে প্রিন্সিপাল এবং সাংসদ ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা জনগণের এজেন্ট এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনগণ যে প্রিন্সিপাল এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় যাঁরা কাজ করেন তাঁরা জনগণের এজেন্ট এই তাত্ত্বিক সত্যটি এখনো জনগণের মনে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। আর যতদিন তা না করবে, ততদিন আইনটির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এর জন্যে বড় প্রয়োজন হচ্ছে মানসিকতার পরিবর্তন।

তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে এই এজেন্ট-মালিক সম্পর্ককে সকলের মনে গেঁথে দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। সেই ইংরেজদের আমল থেকে সরকারি কর্মকর্তারা নিজেদের শাসক হিসেবে দেখতে বা ভাবতে অভ্যস্ত, তখন সরকারি আমলারা কীভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন তা জানার অধিকার জনগণের ছিল না। সেই আমল থেকে বেরিয়ে এসে আমরা প্রায় সত্তর বছর অতিক্রম ক'রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পৌঁছেছি, কিন্তু তারপরও আগের সেই মানসিকতা পরিহার করতে পারিনি। যাঁরা প্রশাসনের কাজে লিপ্ত তাঁরা এখনও নিজেদের শাসক শ্রেণী হিসেবেই দেখেন বলে মনে হয় এবং এখনো তাঁরা তাঁদের কাজে ঔপনিবেশিক আমলের গোপনীয়তার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন। তথ্য অধিকার আইন ক'রে যে এর পরিবর্তন করা হয়েছে, তা তাঁরা এখনও সেভাবে অনুধাবন করেন না তা বোঝা যায় যখন দেখি যে এখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা জনগণের প্রার্থিত তথ্য সহজে দিতে চান না এবং কেবল যখন আবেদনকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁরা তথ্য কমিশনে শুনানির জন্য সমনপ্রাপ্ত হন তখনিই তথ্য প্রদানে রাজী হন। তথ্য কমিশনের গত সাত বছরে প্রায় ৭০০-র কাছাকাছি অভিযোগ শুনানির সিদ্ধান্ত থেকে দেখা যায় যে এখনো শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তারা কেবল তথ্য কমিশনের শুনানিতে এসেই বাধ্য হ'য়ে প্রার্থিত তথ্য দিতে রাজি হন, তার আগে নয়।

তাই বলা যায় যে, আইনটির বাস্তবায়নের ব্যাপারে ডিমান্ড সাইড বা তথ্য আবেদনকারীর অনীহা যেমন সত্যি, তেমনি সাপ্লাই সাইড বা তথ্য প্রদানকারী সরকারি পক্ষের অনীহাও একটি বড় অন্তরায়। দুই পক্ষেরই মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই অবস্থার উন্নতি সম্ভব না। আর এই কাজে যে দু'টি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে, আমার মতে, তারা হচ্ছে তথ্য কমিশন এবং গণমাধ্যম। আজকের এই বিশেষ দিনেআমি গণমাধ্যমের ভূমিকার কথাই বলবো।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সংবাদিকদের ভূমিকা :

আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশে গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সম্প্রদায় তথ্য অধিকার আইনটি প্রণয়নের ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছিল আইনটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সেভাবে ভূমিকা পালন করছে না। পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম হ'তে দেখা গেছে। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যে আইনটি প্রণয়নের আগে সাংবাদিকগণ সাধারণত মনে করেন যে এটি প্রণীত হলে তাঁদের কাজে অনেক সুবিধা হবে। তাঁরা আইনটি ব্যবহার করে সরকারের কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য আরো সহজে জোগাড় ক'রে জনগণকে সরবরাহ করতে পারবেন। কিন্তু আইনটি প্রণয়নের পর তাঁরা যখন এর প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হন তখন এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তাঁরা অনেকে পিছু পা হয়ে পড়েন। তাঁরা তখন মনে করেন যে চিরাচরিত প্রথায় প্রভাব খাটিয়ে বা নানা রকম কৌশল অবলম্বন ক'রে তথ্য সংগ্রহ করাই তাঁদের পক্ষে অধিকতর সহজ এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তাছাড়া তথ্য আবেদন ক'রে কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়া থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। আমার মনে হয় তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে গণমাধ্যমের এই অবস্থানের একটি বড় কারণ আইনটি সম্পর্কে তাদের অসম্পূর্ণ ধারণা ও অভিজ্ঞতা।

দৈনন্দিন কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য অধিকার আইনটি অবশ্যই সাংবাদিকদের তেমন উপকারে আসতে পারে না। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের আরো অনেক বৃহৎ কাজে, যেমন সমাজ পরিবর্তন বা দুর্নীতি উদ্ঘাটন ও প্রতিরোধে, তাঁদের আরও গুরুত্বপূর্ণ যেসব দায়িত্ব আছে, সেখানে তথ্য অধিকার আইনটি যে একটি বিশেষ হাতিয়ার হ'তে পারে, তা হয়তো অনেকেই তেমন ক'রে ভেবে দেখেননি। এ ব্যাপারে আরো একটু মনোনিবেশ করলে তাঁরা দেখবেন যে আইনটির মাধ্যমে তথ্য আবেদন ও প্রাপ্তি প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ হ'লেও প্রয়োজনীয় কোনো তথ্যের গভীরে প্রবেশ ক'রে গোপনীয়তার জাল ভেদ করার জন্যে এর জুড়ি নেই। কোনো ধরনের তথ্য জানতে চাইলে ভেতরের অনেক গোপন খবর বেরিয়ে আসবে, তা ভেবে-চিন্তে আইনটির মাধ্যমে আবেদন করা যায়। তাতে সময় লাগে ঠিক, কিন্তু তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি। কারণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনত সময় মতো উত্তর দিতেই হয়, না দিলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপিল ক'রে তাঁর দৃষ্টিতেও বিষয়টি আনা যায়। তাতে কিছু না হোক তাঁরা সজাগ হন, অনেক কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত হয়ে আইনটি সম্পর্কে জানেন ও ভবিষ্যতে সাবধান হন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর কখনো-সখনো তথ্য চেয়ে তথ্য না পেলেও ক্ষতি নেই। না পেলে তার জন্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যায়। সেখানেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় আর তা নিয়ে প্রতিবেদন করা যায়। আর সব চেয়ে বড় কথা সাংবাদিকরা এ ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল, আর সরকারি কর্মকর্তারা হন এজেন্ট, এ পরিস্থিতি তাঁরা আর কোথায় পাবেন? চিরাচরিত প্রথায় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে কি এই সম্মানটা পাওয়া যায়?

তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সম্পর্ক কী?

এ ব্যাপারে আর একটি কথা মনে রাখা ভালো। তা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বে তথ্য অধিকার আইনটি ট্রান্সপারেন্সি বা স্বচ্ছতা বা সানসাইন আইন নামে খ্যাত। তার কারণ আইনটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা এনে বা তার ওপর সুর্যের কিরণ ফেলে, সে কাজকে আরও নিয়মানুগ ক'রে তোলা ও তার মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারের ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি করা। তাই বলা যায় যে, তথ্য আবেদনের মাধ্যমে শুধুমাত্র তথ্য প্রাপ্তিই আইনটির লক্ষ্য নয়। তথ্য প্রাপ্তির পর সেই তথ্যকে যথাযথ প্রচার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়। তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেয়া যায় যে, সরকার এখন তার সব কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে উন্মুক্ত করতে দায়বদ্ধ এবং আগের মতো গোপনীয়তার অজুহাত দেখিয়ে তা জনগণের কাছ থেকে আড়াল করা যায় না। এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও জেনে যায় তাদের দায়বদ্ধতার কথা। এই দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে না পারলে আইনটির মূল উদ্দেশ্যই বিফল হয়। দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত আইনটির মাধ্যমে সরকারি তথ্য জোগাড় ক'রে, সেই তথ্য সকলের কাছে প্রচারের মাধ্যমে। একজন আবেদনকারী

তথ্য পেয়ে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই উপকৃত হয়, তবে সেই তথ্য সঠিকভাবে প্রচারিত হলেই সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

তাই দেখা যায় যেসব দেশে গণমাধ্যম যত বেশি শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল, যেখানে সাংবাদিকগণ শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁদের কাজে নিষ্ঠাবান, সেখানে জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা তত বেশি সম্ভবনাময়। এর প্রমাণ আমরা অনেক গবেষণা থেকে জানতে পারি। তাই আমাদের দেশে গণমাধ্যম যতদিন তথ্য অধিকার আইনটির ব্যাপারে আরও আগ্রহী ও দায়বদ্ধ না হন ততদিন পর্যন্ত আইনটি যে বেগবান হয়ে উঠতে পারবে না, তা নিশ্চিত ক'রে বলা যায়। তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে আইনটির ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার। এই প্রচার কী কী রূপ ধারণ করতে পারে এখন আমরা সেই আলোচনায় যাবো।

প্রচারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত সৃষ্টি :

বাংলাদেশে গত সাত বছরে তথ্য অধিকার আইন কোনো সুফল বয়ে আনেনি তা অবশ্যই কেউ বলবেন না। আইনটি ব্যবহার ক'রে অনেক ক্ষেত্রে জনগণ অবশ্যই উপকৃত হচ্ছেন, তবে তার ফলে কি সরকারি কাজে কোন সিস্টেমিক বা পদ্ধতিগত পরিবর্তন এসেছে? তা মনে হয় না।পরিবর্তন আসে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর বহুল প্রচারের মাধ্যমে।উদাহরণ সরূপ বলা যায় যে, আমাদের দেশে আজকাল অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আইনটি ব্যবহার করে সরকারের সামাজিক-নিরাপত্তা-বেষ্টনীমূলক (সেফটি নেট) অনেক প্রকল্পের সুবিধা অর্জন করলেও -- যা তারা আগে অনেক ক্ষেত্রে পারতো না -- এসব প্রাপ্তির কথা তেমন ক'রে প্রচার হচ্ছে না ব'লে তার সুফল সকলের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। সঠিক প্রচার হ'লে সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে তাঁর কাজের সততার ব্যাপারে আরো সতর্ক হতেন বলা যায় ও তাহলে তার প্রভাব অন্য জায়গাতও ছড়িয়ে পড়তো। এই ছড়িয়ে দেয়া বা পাবলিসিটি'র কাজটা গণমাধ্যমই সহজে করতে পারে।

তাই বলা যায় যে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা শুধু তথ্য আদায়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন প্রাপ্ত তথ্যেও সঠিক প্রচার বা পাবলিসিটি। সমাজ গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, তথ্য আবেদন ➔ তথ্য প্রাপ্তি ➔ তথ্য প্রচার ➔ স্বচ্ছতা ➔ দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতা এইভাবে ধাপে-ধাপে কাজ ক'রে আইনটি তার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্থাৎ সরকারি কাজে সিস্টেমিক বা পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে তথ্য অধিকার আইনের সাফল্য আরো নির্ভর করে সে দেশের জনগণ কতখানি শিক্ষিত ও সজাগ তার ওপর। তাই বলা যায় যে, একটি দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং একটি স্বাধীন, সজাগ, সক্রিয় ও দায়িতশীল গণমাধ্যম সে দেশে সফল তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। শুধু স্বাধীন হলেই চলবে না, গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলও হ'তে হবে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের করণীয় কয়েকটি দিক :

পরিশেষে, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্যে গণমাধ্যম কীভাবে সহায়তা করতে পারে সে ব্যাপারে আমরা কিছু আলোচনা করবো। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম কীভাবে আইনটি ব্যবহার ক'রে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কিছু উদাহরণ দেবো।

তবে তার আগে একটি মজার কাহিনী বলার লোভ সংবরনণ করতে পারছি না। কাহিনীটি সত্যি ও প্রাসঙ্গিক। কারণ এটি গণমাধ্যমের বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কিত। কাহিনীটির পটভুমি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে। গত শতাব্দীর ৯০ দশকে সেখানে তখন ক্ষমতাসীন এলবার্টো ফুজিমোরি সরকার। তবে তাঁর হয়ে দেশ পরিচালনা করতেন সে দেশের গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ভালডিমিরো মন্টেসিনোস টোরেস। মন্টেসিনোস রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন নানা রকম দুর্নীতির মাধ্যমে ও তার জন্যে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে উৎকোচ বা ঘুষ প্রদান ক'রে। বিরোধী দল, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের মধ্যে কে বা কারা সবচেয়ে প্রভাবশালী তা তিনি তাঁর অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনে গিয়েছিলেন। আর তারই ভিত্তিতে তিনি ঠিক করেছিলেন কাকে কত উৎকোচ দিয়ে হাতে রাখবেন। এভাবে বেশ কিছু বছর কাটার পর সরকারের যখন পতন হ'লো, তখন তাঁর সযত্নে রক্ষিত দলিলপত্র থেকে জানা গেল যে তিনি গণমাধ্যমকে সবচেয়েবেশী ভয়পেতেন। দেশের প্রধান একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে তিনি যে অঙ্কের অর্থ উৎকোচ দিয়েছিলেন তা সমস্ত বিরোধী দলকে দেওয়া অঙ্কের চেয়ে পাঁচগুণ

বেশি ছিল। অর্থাৎ তিনি সংবাদ-মাধ্যমকে জনমত তৈরিতে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করতেন। পৃথিবীর অনেক দেশেই একথা সত্যি। আমাদের দেশেও তাই হবে বলে মনে হয়। তাই আমার মনে হয় যে, আমাদের সংবাদ মাধ্যম চাইলে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-কে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য অর্জনে কেবলমাত্র তথ্য আবেদনকারী ও তথ্য প্রদানকারী দুটি পক্ষের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ শুধু তথ্য চেয়ে ও তথ্য পেয়ে সরকারকে স্বচ্ছ বা জবাবদিহি ক'রে তোলা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ সকলের কাছে যথাযথভাবে প্রচারের। আর গণমাধ্যমই এ কাজটি সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। আমরা আশা করবো গণমাধ্যম গভীরভাবে ভেবে দেখবেন কীভাবে এই প্রচারের কাজটি তাঁরা সম্পাদন করবেন। তাঁরা যদি তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সারা দেশের আনাচ-কানাচ থেকে সব তাৎপর্যপূর্ণ প্রাপ্ত-তথ্য সংগ্রহ ক'রে প্রচার করার একটা নিয়মিত ব্যবস্থা করেন এবং একই সঙ্গে তথ্য কমিশনের শুনানিত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলেই এ প্রচার কাজ সবচেয়ে সফল হয়। সংশ্লিষ্ঠ সাংবাদিকদের উৎসাহ দানে তাঁরা তাঁদের বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দানের কথা বিবেচনা করতে পারেন। তবে এসব হচ্ছে সহজ কাজ। সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে আরও একটি বড় কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনকে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করা ও তা প্রচার করা। আমাদের দেশে তথ্য আবেদনের ভিত্তিতে কোনো তথ্য পেতে সর্বোচ্চ সময় লাগার কথা ৭৫ দিন । সে সময়টুকু দেখতে দেখতেই কেটে যায়। তাছাড়া এক সঙ্গে অনেক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে। সেগুলো একে একে প্রতিবেদন আকারে ছাপা যায়। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, তথ্য অধিকার আইন-ভিত্তিক এইসব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পাঠকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। আমাদের দেশে অনুসন্ধানী সংবদিকতার অনেক ভালো ভালো উদাহরণ আছে। তবে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার ক'রে আমাদের দেশে এই ধরনের সাংবাদিকতার উদাহরণের কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে তেমন জানি না।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী কী বিষয়ে হ'তে পারে তা পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে প্রকাশিত সংকলন থেকে পাওয়া যায়। এগুলো প্রকাশিত হয় তথ্য অধিকার বা ফ্রিডম অব ইনফরমেশন আইনের প্রচারের উদ্দেশ্যে। আমি আমাদের সাংবাদিকদের জ্ঞাতার্থে নীচে যুক্তরাজ্যও স্কটল্যান্ড-এর ফ্রিডম অব ইনফরমেশন আইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০০৬/০৭ সালের এক হাজারের বেশি উদাহরণ সম্বলিত সংকলন থেকে বাছাই করা কয়েকটি বিষয়বস্তু তুলে ধরেছি। এগুলো থেকে আইনটির পরিধি কত ব্যাপক তা সহজেই বোঝা যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

- ইরাক যুদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, যথা, ইরাকে হাসপাতালসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, নাম ও ক্ষতির পরিমান ও সে ব্যাপাওে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা;
- 'গালফ ওয়ার সিনড্রোম' রোগে আক্রান্ত সেনাদের সংখ্যা ও তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা;
- কোনো একটি বছরে সারা দেশে কতজন ব্যক্তিকে চিকিৎসা-বিভ্রাটের কারণে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে;
- সরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করার সময় কমানোর জন্যে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সমস্যা নিয়ে সরকার কী কী চিন্তাভাবনা করছে;
- পুলিশের অপরাধে জড়িত হবার সংখ্যা ও সে ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ কী;
- বহুজাতিক তেল, ঔষুধ ও খাদ্য কোম্পানিগুলোর পক্ষে লবিষ্ট নিয়োগ ও তাদের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য;
- পরমাণু নিরাপত্তা ও অন্যান্য সাম্ভাব্যজাতীয় বিপর্যয় নিয়ে সরকারের তৎপরতা সংক্রান্ত তথ্য;
- প্যারোলে মুক্ত অপরাধীদের আবার অপরাধে জড়িত হবার তথ্য;
- জেল থেকে পলাতক কয়েদীর সংখ্যা ও সে ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপসমূহ;
- সরকারি অফিসে অপচয় ও অবৈধ খরচ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

এসব তথ্যের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে সরকারি কাজে কোথাও কোনো গলদ আছে কিনা, সরকার জনস্বাথে কোথায় কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, কোথায় নিচ্ছে না, কোথায় অনিয়ম হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের অবস্থান কী ও আরো অনেক অজানা তথ্য। এর মাধ্যমে সরকারের ওপর জনগণের আাস্থা যেমন বাড়ে, তেমনি সরকারের জবাবদিহিতাও প্রতিষ্ঠা পায়।

এরপর আমি ভারতের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করবো। সে দেশে ২০০৫ সনে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হবার পর আইনটি ব্যবহার ক'রে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এ পর্যন্ত প্রচুর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যা আইনটিকে জনগণের খুব কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অনেকগুলো উদাহরণ থেকে বাছতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে, আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে ও সময়ের স্বল্পতা বিচার ক'রে একজন সম্পাদকের অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করা যায়। একজন সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা অন্য সাংবাদিকদের আরো সহজে আকৃষ্ট করবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই নোতুন দিল্লি থেকে প্রকাশিত "ইন্ডিয়া টুডে" নামের সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, শ্রী শ্যামলাল যাদব-এর একটি সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি। সাক্ষাৎকারটিতে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের একজন তথ্য অধিকার কর্মী ও আমার সহকর্মী, সুরাইয়া বেগম। তিনিই আমাকে এর একটি কপি দিয়েছেন। অন্যান্য আরো অনেক কথার মধ্যে শ্রী যাদব বলেন: "আমার পত্রিকার সম্পাদক চিন্তা করলেন কীভাবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৫ ব্যবহার করে তথ্য পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে কীভাবে জনগণের অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে জানা যাবে ও যা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখবে। এরপর আমরা আরটিআই আবেদন করা শুরু করি। এসকল আবেদনের অধিকাংশই আমি ডাক যোগে প্রেরণ করেছি। বর্তমানে আমি মাসের ৩০ দিনেই তথ্য আবেদন করি। কারণ তথ্য আবেদনের সাথে আইনটি নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির একটি নিবিড় যোগসূত্র জড়িত রয়েছে। আমরা প্রায় ১৭০০ আরটিআই আবেদন করি। যেসব অফিসে আবেদনপত্র পাঠাই তার মধ্যে প্রেসিডেন্টস্ সেক্রেটারিয়েট, চীফ মিনিস্টারস অফিস, কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধস্তন অফিসসমূহ, স্টেট এসেম্বলি, কালেক্টরেট অফিস, তৃণমূল স্থানীয় প্রশাসন অফিস অন্যতম। প্রথমদিকে কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই আমরা তথ্য পেয়েছি। আমাদের প্রথম তথ্য আইনের মাধ্যমে কেস স্টাডি ছিল মন্ত্রীদের বিদেশ সফর। ৬০ মন্ত্রণালয়ে তথ্যের জন্য ছয় মাস যাবৎ আবেদন করেছি। তথ্যে দেখা গেছে যে, ৭১জন মন্ত্রী গত সাড়ে তিন বছরে যত বিদেশ ভ্রমন করেছে তা ২৫৬ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার মতো। পৃথিবী প্রদক্ষিণের মাইলেজ হচ্ছে আনুমানিক ৪০,০০৮ কিলোমিটার। ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি এই স্টাডি রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। এরপর আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সব মন্ত্রণালয়ে ইউনিয়ন মিনিস্টারদের চিঠি পাঠান। সেখানে বলা ছিল যে, বিদেশ ভ্রমন অফিসিয়াল এবং দেশের ভেতর ভ্রমণের ক্ষেত্রে মাইলেজ এর হিসাব প্রযোজ্য হবে। এটা করা হয়েছে এজন্যে যাতে মন্ত্রীরা বিদেশ ভ্রমণ কম করে এবং খরচ বাঁচায়।"

এই তথ্য পাবার পরের কাহিনী শ্রী যাদব বর্ণনা করেছেন এইভাবে : "আমার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল সরকারি অফিসারদের নিয়ে। এটি ছয় মাস সময় নিয়েছে। আমরা তথ্য পেয়ে দেখেছি ৪৬টি মন্ত্রণালয়ের ১৫৭৬ অফিসার সাড়ে তিন বছরে যে পরিমাণ বিদেশ সফর করেছেন, তাতে ৭৪ বার চাঁদে আসা যাওয়া করা যেত। টোটাল মাইলেজ ছিল ৫,৬৫,৬২,৪২৬ কিলোমিটার। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের অর্থমন্ত্রী দু'টি সার্কুলার জারি করেন সরকারি অফিসারদের অফিসিয়াল ট্রিপ সম্পর্কে। দেশের ভেতরে বরাদ্দ মাইলেজ এর বাইরে যাতায়াত হবে ব্যক্তিগত ট্রিপ, বিদেশ সফর অফিসিয়াল ট্রিপ।"

তিনি আরো বলেন : "আরটিআই আইন তখনই কার্যকরী হবে যখন মিডিয়া একে ব্যবহার করবে যথাযথভাবে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অনেকক্ষেত্রে সেকেন্ডারী সোর্স থেকে তথ্য আহরণ ক'রে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে তাদের উচিত নিজের প্রতিবেদনের তথ্য উপাত্ত নিজেকেই খোঁজা, আহরণ করা, আইডিয়া দৃশ্যমান করা বা প্রকাশ করা। অনেক তথ্য আছে যেগুলো কাজে লাগানো যায় না। সব আবেদন দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা যায় না । কিন্তু এর মধ্যে ৬০টা আবেদন দিয়ে আমি প্রতিবেদন তৈরি করেছি, যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এটা আমার এবং আমার পত্রিকার জন্য একটি বড় অর্জন।"

এরকম আরো অনেক উৎসাহ-উদ্দীপক ও আশাব্যঞ্জক কাহিনী তিনি তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন। অন্যান্য সূত্র থেকেও আরো অনেক উদাহরণ আছে যার মাধ্যমে ভারতে গত এক দশকের বেশি সময় ধ'রে তথ্য অধিকার আইনের সুদূর-প্রসারী প্রভাব জনগণ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে বলা যায়। এর ফলে সে দেশে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় সিস্টেমিক বা পদ্ধতিগত পরিবর্তন এসেছে বলা না গেলেও তার সূত্রপাত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বহুদিনের অজনবান্ধব আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি যে এত সহজে দূর হবে না তা সবাই জানেন। আমরা আশা করবো আমাদের দেশেও অচিরেই একই রকম পরিবর্তন শুরু হবে। আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা সেই অঙ্গীকার করতে পারি।

তাই আবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আমাদের দেশের সরকারি ব্যবস্থায় রাতারাতি পরিবর্তনের কথা না ভেবে আমরা যদি শুধু এর ব্যবহার বাড়ানোর দিকেই এখন নজর দিই তা হ'লেও যথেষ্ট বড় কাজ হবে। তাই সাংবাদিক বন্ধুদের আবার বলবো যে, তাঁরা যেন তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত সংবাদসমূহ প্রচারের দিকে একটু বেশি ক'রে নজর দেন ও তাছাড়া নিজেরাই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্যে আইনটি ব্যবহার ক'রে নিয়মিত তথ্য আবেদন শুরু করেন। তাঁদেরকে আরো মনে রাখতে বলবো যে, তথ্য আবেদন ক'রে কখনো কখনো তথ্য পাওয়া না গেলেও তেমন বড় ক্ষতি হয় না, কারণ প্রক্রিয়াটি নিয়েও প্রতিবেদন করা যায়। আর তথ্য পাওয়া গেলে তো আরো ভালো, সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দেয়া যায়। এর ফলে একদিকে যেমন তথ্য কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের টনক নড়ে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণও এ সকল তথ্য জেনে অনুপ্রাণিত বোধ করে। সাংবাদিকগণ যদি আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এরকম ভূমিকা পালন করেন তাহলে সাধারণ জনগণও এব্যাপারে উৎসাহিত হ'য়ে তথ্য অধিকার আন্দোলনে অংশ নেবেন বলে আশা করা যায়।

# # #